১৫-০২-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বরীয় বাবা তোমাদের কাছে আসেন অসীম বেহদের এই সৃষ্টি-জগতের সেবা করে নরককে স্বর্গ-রাজ্য বানাতে কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই এক ও একমাত্র এই বাবা-ই তা করে থাকেন"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে কি এমন প্রক্রিয়া চলে যা সম্পূর্ণ কল্পে অন্য সময়-কালের থেকে একেবারেই পৃথক ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ কল্পে বাচ্চারাই বাবাকে প্রণাম জানায়, কিন্তু কেবল এই সঙ্গম সময়ে বাবা আসেন, হারিয়ে যাওয়া খুঁজে পাওয়া হারানিধি বাচ্চাদের সেবার উদ্দেশ্যে। বাবার মতে, সে হিসাবে বাবার থেকেও বেশী সম্মানীয় বাচ্চারা। পুরো কল্পের অবসানে, বাবা বাচ্চাদের কাছে আসেন, সমগ্র সৃষ্টি-জগতের ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে এই নরককে স্বর্গ-রাজ্য বানাতে। বাবার মতন এমন নিরাকারী, নির্বিকারী আর নিরহংকারী আর কেউ তো হতেই পারে না। এমন কি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বাচ্চাদের পা মলিশও করে দেন বাবা।

ওঁম্ শান্তি! বাবা যখন বাচ্চাদের সামনে আসেন, তখন কি বাবা প্রথমে বাচ্চাদেরকে নমন জানান, নাকি বাচ্চারা সর্বাগ্রে বাবাকে প্রণাম জানান ? (যেখানে বাচ্চাদেরই প্রথমে তা করা উচিত)। -- কিন্তু না! বাবা-ই প্রথমে নমন জানান বাচ্চাদের প্রতি। সঙ্গমযুগের এই রীতি-নীতিই অন্য সব সময়কালের থেকে একেবারেই আলাদা। তাই বাবা স্বয়ং বলছেন - "যেহেতু আমি তোমাদের সকলের বাবা, তাই তোমাদের সেবা করার জন্যই আমি এসে উপস্থিত হই। সেই হিসাবে তো তোমরা বাচ্চারাই বেশী সন্মানীয় হলে। জাগতিক দুনিয়ার রীতি-নীতি অনুসারে বাচ্চারাই প্রথমে বাবাকে প্রণাম করে, কিন্তু এক্ষেত্রে তো বাবা-ই বাচ্চাদেরকে নমন জানান। তাই তো বাবাকে এমন নিরাকারী, নিরহংকারী হতে হয়। লোকেরা জাগতিক দুনিয়ার সাধু-সন্ন্যাসীদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এমন কি তাদের চরণে চুম্বনও করে। অথচ, যার সঠিক অর্থ তারা কিছুই জানে না। পুরো কল্প বাদে বাবা আসেন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে, যারা হারিয়ে যাওয়া খুঁজে পাওয়া হারানিধি বাচ্চা। তাই তো বাবা এত স্নেহ-ভরে বাচ্চাদেরকে বলেন-"মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।" যেমন ভাবে, অন্যরূপে তিনি দ্রোপদীরও পদ-সেবা করেছেন। অতএব তিনি সেবাধারীই তো হলেন। "বন্দে মাতরম্"- এই সন্মান কে জানিয়েছেন ? --অবশ্যই এই বাবা। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা এসেছেন সমগ্র সৃষ্টি-দুনিয়াতে বেহদের সেবা করতে। এই সৃষ্টি-জগৎ এখন ময়লা-আবর্জনায় ভরে গেছে। আক্ষরিক অর্থে যা নরকে পরিণত হয়েছে। তাই তো এমন সময়ে স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয়, এই নরককে আবার স্বর্গ-রাজ্যে রূপান্তরিত করতে। আর একাজ করতে উনি আসেন- খুব উৎসাহ-উদ্দীপনায়। যেহেতু উনি জানেন, বাচ্চাদের সেবা করতে এক ও একমাত্র এই ঈশ্বরীয় বাবাকেই আসতে হবে। কল্প-কল্প এভাবেই এই সেবায় হাজির হতে হয় বাবাকে। যখন-যখন বাবা স্বয়ং আসেন, তখন-তখন বাচ্চারাও ভাবে, এই তো বাবা এসে গেছেন আমাদেরকে সেবা করবার জন্য। আর এখানে (এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে) বসেই বাবা সকল বাচ্চাদেরই সেবা করতে থাকেন। তবে এমনটা অবশ্যই নয় যে, সেবার জন্য বাবাকেই সবার কাছেই যেতে হবে। লোকেরা তো 'সর্বব্যাপী'-র সঠিক অর্থটাই জানে না। সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকারী ও

কৃপাসিন্ধু দাতা কেবলমাত্র একজনই -এই বাবা। ওনার মতন এই সেবা, যা কোনও মনুষ্যের দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। তাই তো ওনার এই সেবাকে অসীম বেহদের সেবা বলা হয়।

গীত :- ওগো আমার আত্মারূপী প্রেমিকারা- তোমাদের জাগৃতি আসুক এবার! নব-অরুণোদয়ের আলো এই ফুটলো বলে !

ওঁম্ শান্তি! সত্যি, কি অপূর্ব এই গীত। নব যুগ (সত্যযুগ) আর পুরাতন যুগ (কলিযুগ) ..... এই দুই যুগের তফাৎ-এর বোধের উপরেই অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। যুগের বিষয়টা ভালই বোঝে ভারতবাসীরা। ভারতবাসীদের থেকেই অন্যেরা যুগের বিষয়ে যা কিছু, তা জানতে পারে। সত্যযুগ ও ত্রেতার পরে দ্বাপর থেকেই অন্যেরা আসতে শুরু করে। তাই এর পূর্বের যা কিছু তা তারা ভারতবাসীর কাছ থেকেই তা শুনে থাকে। যেহেতু এই ভারতই একমাত্র প্রাচীন ভূ-খণ্ড। একদা যেখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্যত্ব ছিল। তখন ছিল কেবল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। এই প্রচলিত কথা অবশ্য এখনও স্মরণ করা হয়- (শিববাবা) ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণু দ্বারা পালনা করান। যদিও উনি প্রত্যক্ষ তা করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু দ্বারা তা করান। তাই তো ওনার (শিববাবার) এত মহিমা। বাস্তবে, উনি সর্বপ্রথমে সূক্ষ্ম-বতনের রচনা করেন, যেহেতু একমাত্র উনিই তো সৃষ্টিকর্তা। গীতা প্রসঙ্গে সবাই বলে, তাদের নয়নের মণি সর্বশাস্ত্র শিরোমণি -'শ্রীমদভগবৎ গীতা'। কিন্তু, তারা গীতার প্রকৃত রচয়িতা ভগবানকেই জানে না। রচনাকার কে সেই ভগবান ? মুনী ব্যাসদেব সহ অন্যান্য অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা তা জানতে না পেরে, কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে সেখানে। অথচ, এই গীতা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের মাতা-পিতা। অন্যান্য শাস্ত্র-পুরাণের রচনা তো অনেক পরেই হয়। এই গীতা-শাস্ত্রই সবচেয়ে প্রাচীন শাস্ত্র। আচ্ছা, ভগবান স্বয়ং এই গীতা-শাস্ত্র তবে কখন শুনিয়েছিলেন ? তখন নিশ্চয় সর্ব ধর্মেরই উপস্থিতি ছিল এই দুনিয়ায়। বাস্তবে সব ধর্মেরই মূল ও প্রধান এই গীতা-শাস্ত্র। যেহেতু সর্ব ধর্মেরই মান্য গীতা। কিন্তু বাস্তবে তারা তা মানে কৈ ? মুসলমান, খ্রীস্টানেরা যে খুবই কট্টর-পন্থী। তারা কেবল তাদের ধর্ম-শাস্ত্রকেই মানে। যখন তারা তা জানতে ও বুঝতে পারবে যে, এই গীতা-শাস্ত্রই সবচেয়ে প্রাচীন শাস্ত্র, একমাত্র তখনই তারা (ভারত থেকে) তা কিনবে। তারা তো এও জানে না যে, ভগবান স্বয়ং কবে এই গীতা-শাস্ত্র শুনিয়েছিলেন! চিন্ময়ানন্দ বলেছেন, খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর পূর্বে গীতার ভগবান স্বয়ং গীতা-শাস্ত্র শুনিয়েছিলেন। কিন্তু ৩৫০০ বছর পূর্বে ওনার সেই ধর্মের অস্তিত্ব তো ছিলই না। তবে সেই সময় সব ধর্মের একটিমাত্র শাস্ত্র গীতা তা হবেই বা কি প্রকারে। একমাত্র এই বর্তমান সময়েই সব ধর্মেরই উপস্থিতি দুনিয়ায়। তাই বাবা ঠিক এই সময়ে এসে গীতা-শাস্ত্র দ্বারা অন্য সকল ধর্মেরই সদগতি করেন। যেহেতু এই গীতা-শাস্ত্র স্বয়ং বাবার মুখ-নিঃসৃত। কিন্তু, অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা সেখানে বাবার (শিবের) নামের বদল বাচ্চার (কৃষ্ণের) নাম লেখার ফলেই যত সব মুস্কিলের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদের শাস্ত্রের দ্বারা তো এটাও জানা যায় না যে, প্রকৃত শিবরাত্রি কোন সময়-টায় ? তাদের হিসেব অনুযায়ী, শিব-জয়ন্তী আর কৃষ্ণ-জয়ন্তী প্রায় একই সময়েই হয়ে যাচ্ছে। শিব-জয়ন্তী পর্ব শেষ হতে না হতেই কৃষ্ণের জন্ম পালন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম-কর্তব্যে এ কথাও উল্লেখ নেই যে, কৃষ্ণের জ্ঞান রুদ্র যজ্ঞ। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের সূচনা হয় একমাত্র এই রুদ্র শিববাবার মাধ্যমে। যার দ্বারা বিনাশের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। তা তো নিজেরাই দেখতে পাচ্ছো। এর ফলেই আবার আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনার কার্য চলছে। পরে আর অন্য কোনও ধর্মের অস্তিত্বই থাকবে

না। কৃষ্ণের আবির্ভাবও তখনই হয়, যখন আর অন্য কোনও ধর্ম থাকে না দুনিয়ায়। এসব গুহ্য কথা বোঝার ব্যাপার আছে।

সত্যযুগে (স্বর্গ-রাজ্যে) যখন সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের রাজত্ব চলে, তাই সেখানে তখন মনুষ্যও অনেক কম সংখ্যায় থাকে। যেহেতু সেই সময়ে অন্যসব আত্মারা মুক্তিধামেই থাকে। সকলেই মিলিত হতে পারে ভগবানের সাথে। (নিয়মানুসারে) সেখানে বাবাকে প্রণাম করতেই হয় সকলকে। -তাই না ? বাবাও তেমনি আবার এই সময়ে এখানে এসে ওনার আত্মাধারী বাচ্চাদেরকে নমন জানান। প্রতি উত্তরে আত্মাধারী বাচ্চারাও প্রণাম জানায় তাদের পিতা পরমাত্মাকে। বর্তমান সময়ে সেই চৈতন্য-স্বরূপ বাবা, অর্থাৎ পরমাত্মা এই ধরাতেই উপস্থিত। অতএব আত্মারূপী বাচ্চারাও সবাই সেই বাবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত অবশ্যই। সবারই উচিত বাবার সাথে মিলিত হওয়া। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে কৈ ? আসলে, সবার ভাগ্যে তো আর ওনার সাথে সেভাবে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য হয় না। কোটি-কোটির মধ্যে অল্প কয়েক লক্ষ আবার সেই লক্ষের মধ্যেও বিশেষ কেউ কেউ-ই সেই সুযোগ পেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ভক্তরা আর মিলিত হবার সুযোগ পাবে কিভাবে ? --যেখান (পরমধাম) থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে ভগবানের সাথে, একমাত্র সেখানে গিয়েই তাদের মিলন হবে। অর্থাৎ ভগবানের নিবাস স্থান পরমধামে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলে থাকেন, সকল বাচ্চাকেই এই দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করতে পরমধামে নিয়ে যাই আমি। এটাই যে বাবার কর্ম-কর্তব্য। জগতে এখন কত অনেক ভাষা। সংস্কৃত ভাষার প্রচলন করলে, এতসব বাচ্চা, যা তারা অনেকেই তা বুঝতে পারবে না। লোকেরা তো আজকাল সংস্কৃত গীতার শ্লোকগুলি কেবল কন্ঠস্থ করে। খুব সুন্দর রীতিতে সংস্কৃততে পাঠও করে তারা। কিন্তু, অহল্যা, কুব্জা, বা অবলা ইত্যাদিরা ..... তারা সেই সংস্কৃত ভাষা শিখবেই বা কোত্থেকে ? হিন্দী-ভাষা প্রায় সবারই জানা। তাই হিন্দীতেই এর প্রচার সর্বাধিক। অতএব ভগবানকেও সেই হিন্দীতেই শোনাতে হয় ওনার বাণী অর্থাৎ গীতা। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা তো গীতাকে কত অনেক অধ্যায়ে বিভক্ত করেছে। কিন্তু প্রকৃত গীতার বাণীগুলিকে কি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পরিবর্তন করা যায় ? এই মুরলী তো শুরু থেকে এভাবেই চলে আসছে।

বাবার আসার উদ্দেশ্যই হলো, পতিত এই সৃষ্টি-জগতকে পবিত্র বানানো। যেখানে তিনি স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা, সেখানে স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা অবশ্যই তিনি। নরক-রাজ্য বানানো ওনার কাজ নয়। এই নরক-রাজ্য স্থাপনা করে রাবণ।আর বাবা স্থাপনা করেন স্বর্গ-রাজ্য। তাই তো ওনার যথার্থ নাম - 'শিব'। শিবের প্রকৃত অর্থ বিন্দু স্বরূপ। আত্মাও বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু তারা দেখতে কেমন ? কত অনেক ছোট অতি ক্ষুদ্র দেখায় তাকে, - তাই না ? (শরীরের মতন) আত্মারাও কি সেভাবে উপরে গিয়ে বড় হয়ে যায় ? মোটেই না। দেখানো হয় আত্মার অবস্থান দুই ভ্রূকুটির মাঝে। আত্মা সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়, দুই ভ্রূকুটির মাঝে স্ফুলিঙ্গের ঝলকের মতন জ্বলজ্বল করা (অতি ক্ষুদ্র) আশ্চর্য এক তারা। আত্মা এতই ক্ষুদ্র যে, অনায়াসেই সে কপালের ঐ ভ্রূকুটি অঞ্চলে অবস্থান করতে পারে। আত্মার যে আকার ও রূপ, পরমাত্মাও ঠিক সেরূপ। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, এত ক্ষুদ্র প্রতিটি আত্মার মধ্যেই তাদের যার যত জন্ম, সে হিসাবে তা সবগুলিই রেকর্ডের মতন ভরা থাকে তাতে, তাদের নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্য অনুসারে। যা চিরকালীন এবং যার কোনও লয় বা ক্ষয় হয় না, যা ক্রমান্বয়ে একের পর এক চলতেই থাকে। ভীষণ রহস্যের ব্যাপার এটা। পূর্বে কি কখনও এমন কথা তোমাদেরকে জানিয়েছেন বাবা ? পূর্বে শুনেছিলে, আত্মা লিঙ্গরূপ, খানিকটা বুড়ো

আঙ্গুলের আকৃতির। কিন্তু পূর্বেই যদি বাবা এইসব রহস্যের উন্মোচন করে দিতেন, তখন তোমরা তা সেভাবে বুঝতেই পারতে না। এখন জ্ঞান-বুদ্ধির যোগে তা বুঝতে পারছো। এমনিতে তো সবাই বলবে, আত্মা তারার মতনই দেখতে। আত্মার সাক্ষাৎকারও সেই তারা স্বরূপেই হয়। তবে তোমাদের আর সাক্ষ্যাৎকারের কি দরকার ? নতুন দুনিয়ার ? এই বাবাই সেই নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গের রচয়িতা। উনিই সবাইকে এই দুনিয়ায় পাঠান, কর্মফল অনুযায়ী যার যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পালন করাতে। আর কল্পে মাত্র একবার নিজেই আসেন এখানে।

মানুষেরা সবাই এখন শান্তির সন্ধানে। যেহেতু এবার তাদের যেতে হবে শান্তিধামে। তাই এখন শান্তির প্রকৃত ধারণা হওয়ায় জাগতিক এই সুখকে কাক-বিষ্টার মতন ভাবছে তারা। সে উদ্দেশ্যেই সবাইকে জানানো হয়- গীতার মাধ্যমেই যে রাজযোগ শেখানো হয় এখানে, তার দ্বারা রাজারও রাজা হওয়া যায়। যারা বর্তমানের এই সুখকে কাক-বিষ্টার মতন ভাবে, কেবলমাত্র তারাই আগামীতে প্রথমদিকেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু তা কি প্রকারে ? বর্তমানের এসব কিছুই যে প্রবৃত্তি-মার্গের। জাগতিক সন্ন্যাসীরা তো গীতার প্রকৃত অর্থটাই বুঝে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বাবা জানাচ্ছেন - মূলতঃ সন্ন্যাসী দুই-প্রকারের। যদিও তাদের মধ্যেও আবার অনেক প্রকারের সন্ন্যাসী। কিন্তু এখানে কেবল এক-প্রকারেরই সন্ন্যাসী। অর্থাৎ বাচ্চারা, তোমরা যেমন এই পুরোনো দুনিয়ার সন্ন্যাস নাও। ঘর-সংসারে, গৃহস্থ ব্যবহারেই থেকেও তোমাদেরকে পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হয়। তাদের কাছে যদি জানতে চাও যে, তা কি সম্ভব ? তারা বলবে, এমন ভাবে তো অনেকেই থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের কাজ তো আর তা নয়। তাই যদি হতো, তবে তারা নিজেরাই ঘর-সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেবেই বা কেন ? বাচ্চারা, তাই সর্বাগ্রে তোমরা নিজের ও নিজেদের ঘর থেকেই নিজেদের কর্ম-কর্তব্যের মাধ্যমে তা শুরু কর। সর্বাগ্রে নিজের স্ত্রীকে তা শেখাও। শিববাবাও এমন কথাই বলেন যে, সর্বাগ্রে উনি ওনার স্ত্রী অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মাবাবাকে তা বোঝান। অর্থাৎ নিজের ঘর থেকেই পাঠের প্রথম সোপান শুরু করা। যেহেতু এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা- শিববাবার চৈতন্য গৃহস্থী-ঘর। তাই সর্বাগ্রে উনি ওনার স্ত্রী (সাকার ব্রহ্মাবাবা) -কে শেখান। তারপর স্ত্রী তার দত্তক সন্তানদের তা শেখান, যদিও শিখবার ক্ষেত্রেও ধারণা ও ধারণের ক্রমিক অনুসারেই তা শিখতে পারে ব্রহ্মার বি.কে. সন্তানেরা। এসবেও যথেষ্ট বোঝার ব্যাপার আছে। সব শাস্ত্রগুলির মূল- মুখ্য শাস্ত্র হলো গীতা। কিন্তু সেই গীতা শাস্ত্র থেকে কেউ কোনও অনুপ্রেরণাই নেয় না। উঁনি (পরমাত্মা) যে এই সময়েই এই ধরায় উপস্থিত হন, একথা তাদের স্মরণেও আছে। তারই স্মৃতিতেই তো এত অনেক শিব-মন্দির। উঁনি (শিববাবা) স্বয়ং তা বলেন, উঁনি আসেন এক সাধারণ ব্রহ্মার শরীরের আধারে। যেই ব্রহ্মা তার নিজের জন্ম-বৃত্তান্তের অতীত-ভবিষ্যৎ কিছুই জানে না। যা একমাত্র ওনার ব্যাপারই নয়। বাচ্চারা, এখানে তোমরা যারা বসে আছো, তারা সবাই ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান। এমন তো আর হতে পারে না, বাবা কেবল একজনকেই সব বোঝাবে। তাই ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেওয়া তোমরা বি.কে.-ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকেই বোঝান উনি। যজ্ঞ সর্বদাই ব্রাহ্মণদের দ্বারাই হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যেরা যারা গীতা শোনান, তাদের কাছে কোনও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত থাকে না। তাই তাকে যজ্ঞ বলা যায় না। কিন্তু এখানকার এই যজ্ঞ তো অতি বৃহৎ এক যজ্ঞ। যেহেতু তা অসীম-বেহদের বাবার বেহদের যজ্ঞ। যে যজ্ঞ বহুদিন ধরে লাগাতর চলতেই থাকে। ভাণ্ডারের কাজ-কর্মও সে অনুসারেই চলতেই থাকে। কিন্তু এর সমাপ্তি কবে ? -যখন নতুন রাজধানী স্থাপনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাবা জানাচ্ছেন তখন একসাথে সব বাচ্চাদেরকেই উনি সাথে করে স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে

যাবেন। তারপর বাচ্চাদের (কর্ম-কর্তব্য ও পুরুষার্থের) ক্রম-অনুসারে আবার সেই বাচ্চাদেরকে কর্মফল অনুযায়ী পাঠাবেন যার যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করার জন্য।

বাবার মতন এমন ভাবে আর কারওরই বলার বলার ক্ষমতা নেই! বাচ্চারা, তোমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার একমাত্র আমিই তোমাদের দিশা-নির্দেশক পাণ্ডা। যে যে মানুষেরা পতিত অবস্থায় আছে, তাদের সবাইকে পবিত্র বানিয়েই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তারপর তারা তাদের সময় অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করার সময় পবিত্র আত্মারা ধীরে ধীরে আসতে শুরু করে। এখন তো কত অনেক ধর্ম দুনিয়াতে। কেবলমাত্র বিশেষ একটি ধর্মই (দেবী-দোবতা ধর্ম) নেই এর মধ্যে। এরপর অর্দ্ধ-কল্প শাস্ত্র বলে কোনও কিছু থাকে না। তখন কেবলমাত্র 'গীতা' থাকে, যা সব ধর্মেরই, যে সকল শাস্ত্রেরই শিরোমণী এই একটিই থাকে কেবল। যেহেতু একমাত্র এর দ্বারাই সবার গতি ও সদগতি হতে পারে। অতএব সবাইকে তা বোঝাতে হবে। আর এই সদগতি হয় কেবলমাত্র ভারতবাসীদেরই। অবশ্য গতি কিন্তু সবারই হয়। সেই ভারতবাসীদের মধ্যেও সর্বাগ্রে জ্ঞানের পাঠ তারাই নেবে, যারা একেবারে শুরুর দিকে পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তারাই সর্বাগ্রে জ্ঞান ধারণ করবে। তারাই আবার সবার আগে ঘরে ফেরা শুরু করবে। সেখান থেকে সবারই আসতে হয় তাদের নিজ নিজ ক্রমিক অনুসারে। সতো-রজঃ-তমো স্থিতির গুণগুলিকে পার করতে হয় সবাইকে। কল্প-চক্রের আয়ু এখন একেবারেই শেষ পর্যায়ে। এই এখন প্রায় সব আত্মারাই এই দুনিয়ায় উপস্থিত। এমন কি বাবাও স্বয়ং এসে উপস্থিত। কারণ (কর্মফল অনুসারে) প্রত্যেককেই তার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট তো করতেই হয়। জাগতিক নাটকে যেমন সকল অভিনয়কারী একত্রে আসে না, যার যার নিজের পার্টের সময় অনুসারে রঙ্গমঞ্চে এসে পার্ট করে। বাবা তো সেসব ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়েই দেন, কিভাবে আত্মারা তাদের নিজের নিজের ক্রম-অনুসারে আসতে থাকে। বর্ণের (জাতি) রহস্যের বিষয়েও সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। চূড়ামণি হলো ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু ব্রাহ্মণদের এমন উচ্চ বানায় কে ? বর্তমান এই শূদ্রযুগের কেউ নিশ্চয় তা বানাতে সক্ষম নয়। সেই চূড়ার উপর আবার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় থাকে ব্রাহ্মণদের বাবা যিনি ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মার বাবা আবার 'শিববাবা'। তাই তোমরা বি.কে.-রা হলে শিববংশী ব্রহ্মা-মুখ বংশাবলী অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা দত্তক সন্তান। তোমরা বি.কে.রাই পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও। বর্ণের এই হিসাবগুলিও লোকেদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে সেই আদেশই দিয়ে থাকেন। এ তো জানা কথাই যে, সবাই একই প্রকারের দক্ষতাসম্পন্ন কুশলী হয় না। জ্ঞানে আসা কোনও নতুন বাচ্চার সঙ্গে কোনও বিদ্বান-পণ্ডিত ব্যক্তি এসব বিষয়ে তর্ক জুড়ে দিলে সে তার যথাযথ উত্তর দিতে পারবে না। তখন তার বলা উচিত - "যেহেতু এই জ্ঞান-মার্গে আমি নতুন, তাই আপনি যদি অমুক সময়ে আসেন, তবে আমার অগ্রজরা এসে আপনাকে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে। আমার চাইতে অনেক বেশী জানে, এমন জ্ঞানী এই জ্ঞানের পাঠে অনেকই আছে। আমার তো এখনও আরও অনেক কিছু শেখার বাকী আছে।" জাগতিক স্কুলগুলির ক্লাসেও এমনি ক্রমিক অনুসারে থাকে। কখনই তাদের দেহ-অভিমানে আসা উচিত নয়। তা হলেই তোমার এবং বাবার উভয়েরই মান-সন্মান সব খুইয়ে ফেলতে পারো। তখন আবার লোকেরাই বলবে, বি.কে.রা নিজেরাই ভালভাবে পুরোপুরি এসব বোঝে না, অপরকে তা বোঝাবেই বা কি প্রকারে ? আর এই কারণেই বাবা বার-বার বলেন, দেহ-অভিমানকে ঝেড়ে ফেলে তখন অন্যকে সে দ্বায়িত্ব সঁপে দিতে। বাবা আবার এও বলেন, উনিও বাচ্চাদেরকে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। জাগতিক পণ্ডিদের কাজই তো হলো, অপরের মাথা খারাপ করা। তাই তাদেরকে তখন বলতে হবে, "অপরাধ নেবেন না, আমায় ক্ষমা করুন, আমি যে এখনও

শিক্ষার্থী। আগামীকাল আসুন আপনি, তখন আমাদের অভিজ্ঞ ভাই-বোনেরা আপনাকে তা বুঝিয়ে বলতে পারবে।" বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও অতি-জ্ঞানী মহারথী, দক্ষ-বি.কে. যেমন অশ্বারোহী, অল্প-জ্ঞানী অর্থাৎ সামান্য সৈন্য এমনও তো আছে। কেউ কেউ আবার সিংহের মতো তেজি লোকদেরকেও অধীন বানাতে হয়। যেখানে এমন লোকেরা খুবই ত্যেজবান হয়, যদিও এমন লোকেরা একা-একা নিজেরাই নিজেদের জ্ঞান-অন্ধকার জঙ্গলেরই রাজা হয়। হাতিরা কিন্তু তোমাদের মতন দলবদ্ধ হয়েই থাকে। সেই হাতিই যখন আবার একা-একা থাকে, তখন তাকে কেউ মেরে ফেলতেও পারে। আবার সিংহের মতো তেজি লোকেরা জাগতিক জ্ঞানে যতই পাণ্ডিত্য দেখাক না কেন, জ্ঞানের শক্তিধারী বি.কে.বোনেদের জ্ঞানের কাছে পরাজিত তারা।

তোমাদের এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য দেশ-বিদেশের চর্তুদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাবা তা লক্ষ্য রেখে চলেছেন, কে কতটা আগ্রহভরে তা করে চলেছে। লোকেদের ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করাতে হবে যে, প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্ম কে স্থাপনা করেন। অনেকে হয়ত বলবে, তা তো দেবী-দেবতারা নিজেরাই তা করেছেন। তারা ভাবে যে, দেবী-দেবতা ও ঈশ্বর পৃথক সত্বা। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই তারা ভগবান-ভগবতী ভেবে থাকে। যা ঈশ্বরীয় নিয়মের পরিপন্থী। আসলে তো তারা দেবী-দেবতা। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই যদি ভগবান-ভগবতী বলা হয়, তবে তো তারও উপরের স্তরের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও ভগবান বলতে হয়। এসব বোঝার জন্য বিশেষ বোধের দরকার। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের নমন জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ-অভিমানে না গিয়ে নিজের থেকে বড়কে এগিয়ে রাখতে হবে। বাবার মতনই নিরহংকারী হতে হবে বাচ্চাদেরকে।

২) শুরুটা সর্বাগ্রে নিজের ঘর থেকেই হওয়া উচিত (চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম) ..... সর্বাগ্রে নিজের গৃহস্থ পরিবারের ব্যবহারকে পদ্ম ফুলের মতন বানাতে হবে। ঘর-গৃহস্থের মধ্যে থেকেই নিজের বুদ্ধিকে বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়াতে থেকেও সন্ন্যাস নিতে হবে।

বরদান :- তিন কাল আর তিন লোকের জ্ঞান ধারণকারী বুদ্ধিমান বাচ্চারা বিঘ্ন-বিনাশক হও

বিস্তার :- যে তিন কাল আর তিন লোক-এর জ্ঞানে জ্ঞানী যে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান অর্থাৎ গণেশ। (জ্ঞানের দেবতা) গণেশ অর্থে বিঘ্ন-বিনাশক। সে কোনও পরিস্থিতিতেই অপরের প্রতি বিঘ্নরূপ হতেই পারে না। কিন্তু, অপর কেউ যদি তার প্রতি বিঘ্ন-রূপ ধারণ করে, তখন যদি তুমি বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারো, তাতে অবশ্যই সেই বিঘ্ন নাশ হয়ে যাবে। বিঘ্ন-বিনাশক আত্মারা বাতাবরণ ও বায়ুমণ্ডলকেও পরিবর্তন করে দেয়, অথচ অপরকে তার কোনও বর্ণনও করে না তারা।

স্লোগান :- নিজের চলন আর চেহারার দ্বারা সত্যতার ভব্যতা অনুভব করানো-ই হল প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ।